*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 217 - 223*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848*

# সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' : দেশভাগের জীবন্ত দলিল

রাহুল মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID : rahulmondal1045@gmail.com

***Received Date*** *21. 09. 2024*
***Selection Date*** *17. 10. 2024*

***Keyword***
*Riots, partition, refugees, social problems, family, black market, hopeful.*

***Abstract***
*Riots, partition and refugee problems are inextricably linked with independence in India. These social problems ushered in the decline of human life. Similarly controlled literature. Many poems, stories, novels, plays and essays were written on such living issues. Several films have been produced. The topic of partition has come up in numerous memoirs. Salil Sen, a well-known personality of the Bengali theater world, wrote his play 'Natun Yehudi' focusing on riots, partition and refugee issues. After the partition of the country, the misery and pain of the people who were separated is reflected in this play. Partition created extreme uncertainty in various moments of human life. The crisis of livelihood, the crisis of living with dignity, the crisis of living by eating and drinking had reared its head. His brilliant image has emerged in the drama 'New Jew'. Playwright Salil Sen focuses on a Brahmin family and a Namashudra family to show the fate of the fragmented people of East Pakistan and India.*

*A family uprooted from East-Pakistan arrives at Sealdah station in India and spends the day with other refugees. Within a few days, they arrived in a slum in Kolkata. All accumulated money is lost. Going out in search of work is disappointing. The family faced an extreme financial and social crisis. Finally the head of the family and one son died. Ginny fell unconscious. The only daughter was forced to go to Kusang. The family had a kind of solemn burial. Yet the playwright does not end the play with only despair and lamentation. He ended the drama by giving a message of hope even in the midst of nightmares. Relying on the young generation, he tried to rejoin this fragile society. One of the characters of the drama is Mohankei, his representative has done. It has been widely observed throughout our discussion.*

**Discussion**

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সেখানে সমকালীন সময় ও সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়। মানুষ এই সময় ও সমাজের বহিরঙ্গে নয়। তাই সাহিত্যে মানব জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি সবকিছুই উঠে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে শব্দটি স্মরণে আসে তা হল দেশভাগ। আর এই দেশভাগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা।

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের আগস্ট স্বাধীন হয়। এই স্বাধীনতার পূর্বে যে রক্তের ধারা বয়েছিল সেই স্মৃতি আজও মানুষের মনে গেঁথে আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারকীয় অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, সর্বোপরি অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত হওয়ার যন্ত্রনা আজও মানুষ ভুলতে পারেনি। স্মরণে আসে বিষ্ণু দে-র সেই বিখ্যাত কবিতার কথা —

> "এখানে-ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
> পার্কের ধারের শানে পথে-পথে গাড়িবারান্দায়
> ভাবে ওরা কী যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
> এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ-বা ঢাকায়।"[১]

রাতারাতি আজকের স্বদেশ হয়ে যায় কালকের বিদেশ। শিকড় ছেঁড়া মানুষগুলো পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূর্বে। পিছনে ফেলে আসে চিরপরিচিত ঘর-বাড়ি, নদী-নালা, পুকুর-বাগান সবকিছু। দেশভাগ মানুষকে এক কঠিন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। চোখের সামনে তাদের দেখতে হয়েছিল ধর্ষণ ও লুণ্ঠন। সহ্য করতে হয়েছিল অমানুষিক যন্ত্রনা। ছিন্নমূল মানুষগুলি রাতারাতি পরিণত হয়েছিল খেলার পুতুলে। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে দেখি সেই পরিণতি —

> "শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেঁধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল— চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে। লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলেছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলী ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।"[২]

শুধু যে দেশ ভেঙে দু-টুকরো হয়েছিল তাই নয়। জীবনের নানা মুহূর্তে চরম অনিশ্চয়তা, জীবন জীবিকার সংকট, মান-সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার সংকট, খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার সংকট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। গৃহে নেই মানুষ। গ্রাম শূন্য। অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল সমস্ত ভূমি। যে কথা জীবনানন্দ দাশ তুলে ধরেছেন '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় —

> "বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল
> সূর্য অস্ত চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
> খোঁপা বেঁধে নিতে আসে— কিন্তু কার হাতে?
> আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে— কিন্তু কার তরে?
> হাত নেই— কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
> আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
> হ'তে পেরেছিল গ্রাম; নিভে গেছে সব।"[৩]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যান্য নানা সমস্যা সমাধানের জন্য দেশভাগই হয়ে উঠেছিল একমাত্র সমাধান। কিন্তু দেশভাগ করে কী মানুষের সহস্র সমস্যার সমাধান ঘটেছিল? এর উত্তর হয়তো কারও অজানা নেই। বড়ো বড়ো নেতাদের উদ্দেশ্যে তাই অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন —

> "তেলের শিশি ভাঙলো বলে
>     খুকুর পরে রাগ করো
> তোমরা যে সব বুড়ো খোকা

ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?"[৪]

কেনই বা সেদিনের তাবড় তাবড় নেতারা এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য দেশভাগকেই একমাত্র উপায় বলে বিবেচনা করলেন? এ বিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। চন্দনকুমার কুণ্ডু লিখেছেন —

> "দাঙ্গা ও দেশভাগ শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর নানা দেশেরই এক ভয়াবহ, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা-যা ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন, সঞ্চিত মূল্যবোধ এবং পুঞ্জিভূত স্বপ্ন ও স্মৃতিকে তছনছ করে দিয়েছে।"[৫]

এই দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে বহু সাহিত্য। নির্মিত হয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সহ সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

দেশভাগজনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছে বহু নাটক। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' (১৯৫০), 'দলিল' (১৯৫২), 'সাঁকো' (১৯৫৪), তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি' (১৯৫৩), বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' (১৯৫৬), সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' (১৯৫১), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নয়াশিবির' (১৯৬৪), 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'মশাল' (১৯৫৪), 'অপচয়' (১৯৫৭), 'জীবনস্রোত' (১৯৬০), শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন' (১৯৪৯), ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'আর হবে না দেরি' (১৯৬১), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'এই স্বাধীনতা' (১৯৪৯) প্রভৃতি। নিম্নে 'নতুন ইহুদী' নাটকটির উপর আলোকপাত করা হল।

সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' নাটকটি 'উত্তর সারথী' প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে অভিনয় করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন 'কালিকা' রঙ্গমঞ্চে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুলাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের অভিনয় হয়। সমকালীন বাস্তব নানা সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে এই নাটকে। কাজেই নাটকটির অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা ও সমালোচনা দুইই গ্রহণ করতে হয়েছিল নাট্যকারকে। সলিল সেন জানিয়েছেন —

> 'উত্তর সারথি' গোষ্ঠীর জন্যেই লিখলাম 'নতুন ইহুদী' নাটকটা। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সমস্যা বেদনা নিয়ে এই নাটক। নামটা ইচ্ছে করে 'নতুন ইহুদী' রেখেছিলাম। কিছুটা প্রতীকী। হিটলারের অত্যাচারে যেমন জার্মানি থেকে ইহুদীদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। ঠিক সেইরকমই অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয় পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারিত মানুষদের। তাই নাটকের নাম 'নতুন ইহুদী'। 'নতুন ইহুদী' মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিষয়বস্তুর জন্যেই কিছু মানুষ আকর্ষণ অনুভব করেন। খুব সমালোচনাও হয়। এ ধরণের বিতর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লিখলে যে প্রশংসা সমালোচনা পাশাপাশি চলবে এ আমি অবশ্য জানতাম। ...বলা যেতে পারে 'নতুন ইহুদী' আমার জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক হয়ে আছে।"[৬]

স্বদেশ থেকে উৎখাত হয়ে উদ্বাস্তু মানুষগুলির হন্যে হন্যে ঘুরে বেড়ানোর যন্ত্রণার কথা, দুর্দশার কথা 'নতুন ইহুদী'-তে ফুটে উঠেছে। নাটকে পূর্ব-পাকিস্তানের একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনির অগ্রগতি ঘটেছে। একই সঙ্গে উঠে এসেছে একটি নমঃ শুদ্র পরিবারের কথা। তৎকালীন সমাজে হিন্দুধর্মের এই দুটি জাতির মধ্যে জাতিগতভাবে দূরত্ব ছিল অনেকখানি। কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণা দুটি পরিবারের কাছেই সমতুল্য। ভিটেমাটি ছেড়ে দুটি পরিবারকেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে চলে আসতে হয়েছিল।

দেশভাগের সিদ্ধান্ত মানব জাতির বুকে যে ভয়ানক অবক্ষয় ডেকে এনেছিল তার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে এই নাটকে। নাটকের প্রথম দৃশ্যের পটভূমি পূর্ব-পাকিস্তান। এই দৃশ্যে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারটির অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে। এই পরিবারের প্রধান মনোমোহন ভট্টাচার্য। তিনি একটি বিদ্যালয়ের পণ্ডিতমশাই ছিলেন। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি কর্মচ্যুত হয়েছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। দেশভাগের ফলস্বরূপ এবং চাকরির আশায় মনোমোহন স্ত্রী, কন্যা ও দুই পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। সম্বল বলতে ছিল বাস্তুভিটে বিক্রির সামান্য কিছু টাকা এবং স্কুলের দুই মাসের মাইনে। গ্র্যাচুয়িটির টাকা

তখনও পাননি। অন্যদিকে নমঃশুদ্র পরিবারটির প্রধান কেষ্টদাস ভুঁই ও তার স্ত্রীও ভিটেমাটি বিক্রি করে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন।

কলকাতায় এসে দুটি পরিবারটিকেই আর্থিক ও সামাজিক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যা যে কতটা সত্য ও বাস্তব তা কেষ্ট-গিন্নির সংলাপেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মনোমোহনের স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন —

> "মা ঠাইন্ গরীবের দুঃখ কষ্ট সর্বত্তরই এক। যে চুলায়ই যাই, ভাতের কষ্ট আর এই জন্মে মিটবে না গো।"[৭]

নাটকে শিয়ালদহ স্টেশনে অবস্থিত উদ্বাস্তুদের এবং কলকাতায় বস্তির মানুষগুলির দিন যাপনের চিত্রটি দেখলে কেষ্ট-গিন্নির এই মন্তব্য আরও ভীষণভাবে উপলব্ধি করা যায়।

কলকাতায় কিছুদিনের মধ্যেই মনোমোহনের পরিবারে ব্যাপক আর্থিক দুর্দশা নেমে আসে। সঞ্চিত অর্থ সব শেষ হয়ে যায়। চাকরির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। 'শহীদ পরিবার'-এর জন্য প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য নিতেও অস্বীকার করেন। ক্ষুধার জ্বালায় দুইখ্যা চৌর্যবৃত্তি ধারণ করে। শুধু দুইখ্যা নয় অভাবের তাড়নায় বহু মানুষ অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হয়। নাটকের নবম দৃশ্যে মোহনের সংলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে —

> "—আমরা নীতি-বিবর্জিত। আমাগো ছোট ছোট ছেলেরা পকেট কাটে, পড়াশুনা করে না—ট্রামে-বাসে বিনা পয়সায় চুরি কইরা চড়ে—আমাগো বউ-ঝিরা বেআব্রু হইয়া রাস্তায়, দোকানো [দোকানে], হাটে, বাজারে উদরান্নের সংস্থানের লেইগা সৎ অসৎ নানা রকম গোপন বৃত্তি গ্রহণ করে, প্রমাণ হয় আমরা ইতর— আমরা নীতিহীন। আমরা সক্ষমপুরুষেরা এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা কইরা চাকরীর চেষ্টা করি—তাই আমরা নীতিহীন।"[৮]

অর্থাভাবে মোহনের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে সে কিছুদিন কুলিগিরি করে। পরে একটি কারখানায় চাকরি নেয়। রাজনৈতিক কর্মী মহেন্দ্রের পরামর্শে ধর্মঘট হওয়া কারখানার চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়। একমাত্র কন্যা পরী ঘরের মধ্যে অনাহারে দিন কাটাতে থাকে। তার উপর নারী মাংসলোলুপ মানুষের দৃষ্টি পড়ে। নানা প্রলোভন তাকে গ্রাস করতে চায়। তার সতীত্বকে কটাক্ষ করে বড়োবাবুর দালাল যতীন পরীকে বলে —

> "...যদি লোক-দেখানো সতীপনা না করতে তো তুমিই ওদের খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখতে পারতে। আর এই যে তোমার ছোড়দা হকারি করছে, তা'তে কি সংসার চলে? —চিকিৎসা চলে? এর পরেও টাকার দরকার হবে, তোমার মেজদার আর তোমার বাবার চিকিৎসার জন্যে কে দেবে টাকা— বলতে পার? এখন বেশী সতীপনা না ফলিয়ে, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো—"[৯]

অভাবের তাড়নায় ও পরিবারকে সাহায্য করার জন্যই শেষ পর্যন্ত পরী যতীনের সঙ্গে চলে যায়। যতীনের মতো ছেলেদেরও অভাবের জাঁতাকলে পরেই বড়োবাবুদের মতো নারী মাংসলোভী মানুষদের দালালী করতে হয়। নিজের কুকর্মের জন্যই সে গুপ্তিকে বলেছে —

> "...পেটের দায়ে যে পাপ করছি, তাতে আমার নরকবাস হবে, তা জানো ওস্তাদ?"[১০]

অর্থনৈতিক সংকট মানুষকে নানা অসামাজিক কর্মের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়; সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত সংকটই মধ্যবিত্ত সমাজকে ধ্বংশের দিকে নিয়ে গেছে। নাটকের নবম দৃশ্যে মহেন্দ্রের সংলাপে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে —

> "...আজ গোটা মধ্যবিত্ত সমাজই ধ্বংসের পথে, তাদের আর্থিক জীবনে আজ ভীষণ বিপর্যয়। তাদেরও সামাজিক বন্ধন আজ ভগ্নপ্রায়। অভাবের তাড়নায় তাদের অবস্থাও ঠিক অমনটিই হবে। তাদের সন্তানেরাও ওই ভাবে ট্রামে-বাসে চুরি করে বেড়াবে; তাদের মেয়েদেরও বেআব্রু হয়ে হাটে বাজারে এসে সৎ অসৎ গোপন বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে। আপনাদের এই ভগ্ন, নষ্ট-সাংস্কৃতিক জীবনের ঢেউ তাদের সমাজ জীবনেও আঘাত করবে। তফাৎ হচ্ছে— ধ্বংসের

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

পথে আপনারা প্রথম, তারপর তারা। অভাব আজ সমাজে মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরিয়েছে! শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই; শতকরা পঁচানব্বুই জনেরই এই অবস্থা।”[১১]

এই সংকটের পেছনে রাজনৈতিক অচলাবস্থার পাশাপাশি অর্থলোলুপ মানুষের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। নাটকের সপ্তম দৃশ্যে বিয়ে বাড়ির চিত্রটি দেখলেই তা উপলব্ধি করা যায়। এই দৃশ্যে গণেশ ও দেববাবুর সংলাপেই তা ফুটে উঠেছে—

“গণেশ : জানেন, আপনার যখন আসতে দেরী হচ্ছিল, ওঁরা বলছিলেন, এত লোককে খাইয়েছেন—আর এত রকম ‘item’ করেছেন যে আপনাকে ‘রেশনিং-আইনে শাস্তি দেওয়া উচিত। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)।

দেবুবাবু : তা তুমিও তো ঠাট্টা করে’ বলতে পারতে যে, জামাইবাবুকে শাস্তি না দিয়ে ‘সিভিল সাপ্লাই’-এর ‘প্রকিওরমেণ্ট’টা দিয়ে দিন না কেন? আপনাদের কাছে হেঁট না হয়ে গোটা বাঙলাদেশের লোককে শুধু ‘ব্ল্যাক-মার্কেট’-এর মাল কিনেই উনি একবেলা খাইয়ে দিতে পারেন। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)।

গণেশ : সে আমি যা বলেছি—উনিতো হেসেই খুন—

দেবুবাবু : তা’ রান্নার সুখ্যাতি ক’রলেন তো?

পণ্ডিত [গণেশ] : হ্যাঁ তা’ আর বলতে। ওঁর মিসেস ওঁকেই বললেন, ‘পানিশমেণ্ট-এর কথা তো খুব বললে, কিন্তু খাওয়ার বেলা তো কম খেলে না দেখলুম।’ কর্ত্তা, হো হো করে হেসে বললেন—কি করবো, রান্নাটা যে বড় ফার্স্ট ক্লাশ হয়েছে। হ্যাঁ খাইয়েও বটে! আর ঘুষের পয়সা খেয়ে খেয়ে পেটটাও বড় হয়েছে তো—

দেববাবু : এদের মতো লোকের জন্যেই তো দেশের এই দুরবস্থা। কোথাও ‘ডিসিপ্লিন’ নেই— ‘ব্ল্যাক মার্কেট’ অবাধে চলছে— ময়দার দামটা কেমন দাঁও মেরে নিলে। আর বলব কি? এদের ‘মারচেণ্ট’রা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে... বুঝলে, আইন-ফাইন ওই ছটাকীদের জন্যে; টন-ওয়ালাদের সামনে এরা ভয়েই মাথা তুলতে পারে না।”[১২]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পঞ্চাশের মহামন্বন্তর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ/ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) সৃষ্টির মূলেও অন্যতম কারণ ছিল এই ব্ল্যাক মার্কেট। বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকে (১৯৪৪ খ্রিঃ) তা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। ‘নবান্ন’ নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বিয়ে বাড়িতে লোকজনের কথোপকথনে তা ধরা পড়েছে —

“বড়োকর্তা : অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন—

২য় ভদ্রলোক : তার আর কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে— করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাকমার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী? বেশি কী কথা, এই ধর না সামান্য চিনির ব্যাপারটাই! সংসারে গিন্নি বলেন, মাসে অতি কম দেড় মণ চিনি তাঁর চাই-ই, নইলে মানে ওদিকে সে একেবারে বুঝতেই পারছ, ডেড্‌লক, কম্‌প্লিট্ ডেড্‌লক। তা এখন কোথায় পাবে তুমি এই চিনি? ওপ্‌ন্ মার্কেটে যাও, নেই নেই নেই নেই, হাত উলটেই বসে আছে সব দোকানিরা। কোথাও পাবে না তুমি এই চিনি। কী করবে? তাও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল? পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।”[১৩]

চিরকালই অসৎ উপায় অবম্বনকারী, উচ্চবিত্ত, ধনীরাই এই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। সুখের সাগর যেন তাদের জন্যই বিদ্যমান। ‘নতুন ইহুদী’ নাটকে টিটাগড় অঞ্চলের কর্মী ভিখুয়ার কাওয়ালী গানের মধ্যে সেই সুর বার বার ভেসে উঠেছে —

“হাম গরীবোঁকা কেয়া দুনিয়া

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

দুনিয়া পয়সেবালে কো।।
হাম মজলুমোঁকো কেয়া দুনিয়া
দুনিয়া পয়সেবালে কো...”[১৪]

এই চিরন্তন সত্যের ফলেই সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজটা ক্রমশ ধ্বংশের দিকে এগিয়ে গেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে তুলেছে। উদ্বাস্তু জীবন মানুষকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সামাজিক অবক্ষয় মানুষকে মৃত্যুর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আলোচ্য নাটকের পরতে পরতে সেই চিত্র ফুটে উঠেছে। তা সত্ত্বেও নাট্যকার কেবলমাত্র হতাশা, হাহাকার কিংবা মৃত্যু দিয়ে নাটক শেষ করেননি। দুঃস্বপ্নের মাঝেও এক আশার বাণী দিয়ে নাটকের ইতি টেনেছেন।

তরুণ প্রজন্মের উপর ভর করে এই ভঙ্গুর সমাজে আবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেছেন নাটককার সলিল সেন। নাটকের অন্যতম চরিত্র মোহনকেই করে গেছেন তার প্রতিনিধি। বড়োদাদার মৃত্যু, বাবার মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু, বোনের যতীনের সঙ্গে চলে যাওয়া, মায়ের অচেতন অবস্থার মাঝেও মোহনকে লড়াই করে বেঁচে থাকার সাহস জুগিয়েছেন ভিখুয়া ও মহেন্দ্র। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও মোহনকে ভিখুয়া বলেছেন –

> “—ছোটাঠাকুর ডরো মৎ। দুঃখকে সাথ লড়ো— নসীবকে সাথ লড়ো— আগে কদম রাখখো, লড়াইমে হঠো মৎ। মরণে হো তো শেরকা তরাহ্ মরো— বলিদান কা বিশ্বাসী— বারোঁ মরো, আউর অমর বন যাও!”[১৫]

রাজনৈতিক কর্মী মহেন্দ্র মোহনকে বলেছেন –

> “বাঁচতে হবে তোমার নিজের জন্যে। তোমার মারে বাঁচাতে হবে তোমার জন্যে। তোমার মত নিরুপায় ভাগ্যের হাতে বন্দী হতভাগ্যদের বাঁচাবার জন্যেই তোমায় বাঁচতে হবে। তাদের প্রত্যেকের দরজায় দরজায় ঘুরে তোমার দুঃখের কাহিনী শোনাতে হবে, আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে, নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে, হৃদয়হীন শোষকদের বিরুদ্ধে, তোমাদের দাবীকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ...মাকে ডাক, মাকে বাঁচাও। শিখে নাও কেমন করে মা তোমার দাদার মৃত্যুশোক (মোহন মায়ের কাছে গিয়া বসিল) সহ্য করেও তোমাদের মানুষ করেছেন। তোমার বড়দাদার উত্তর-সাধকরূপে সে মন্ত্র শিখে নাও। মাকে ডাক, মাকে বাঁচাও। আর মনে মনে সমস্ত প্রপীড়িতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শপথ নাও যে স্বার্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা তোমাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের শাস্তি দেবে। হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার তুমি খতম করবেই, ভাগ্যের গোলামী তুমি আর বরদাস্ত করবে না কিছুতেই।”[১৬]

নাট্যকার মোহনের উপরেই আস্থা রেখেছেন। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জনিত সহস্র সমস্যার মাঝেও তিনি মোহনের মধ্যে দিয়েই নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন—

> “আসল বক্তব্য মোহনকে ঘিরেই; আগামী দিনের মৃণাল তো এরাই। আশার পদ্ম এরাই ফুটিয়ে তুলবে। তার বড় ভাই দেশের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিল, মৃত্যুও হয় তার। সেই দেশ কি দিয়েছে? মোহন প্রতিশোধ নিতে চায়, তারপর সে নিজের মৃত্যু চেয়েছে, চেয়েছে অচেতন মা-এর মৃত্যুও; কিন্তু শেষ পর্যন্ত উজ্জীবিত হয়েছে সে। ...আগামী দিনের এই প্রতিরোধ, সংগঠিত ক্ষমতা নিয়ে ভাগ্যের গোলামী-অস্বীকার ‘নতুন ইহুদী’র শক্ত ভূমি। নতুন প্রজন্মের কাছে এই গৌরবময় টিকে থাকার লড়াই-এর কথাই বলে ঐ নাটক। মোহন তারই প্রতীক। নবনাট্য আন্দোলনের উপযুক্ত শরীক চরিত্রটি।”[১৭]

নাট্যকার ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার দিয়ে নাটকের সূচনা করলেও নাটকের অন্তিম পর্বে তিনি এই হাহাকার থেকে বেড়িয়ে আসার বার্তা দিয়েছেন। কারণ আগামী পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে সমস্ত স্তরের মানুষকেই লড়াই করতে হবে।

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 217 - 223*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

লড়াই করেই সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে। তাই নাটককার মোহনকে উদ্দেশ্য করে আগামী জাতিকে বেঁচে থাকার জন্য সাহস দিয়ে গেছেন।

## Reference:

১. দে, বিষ্ণু, জল দাও, বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, পৃ. ১০৬
২. বসু, সমরেশ, আদাব, সমরেশ বসুর বাছাই গল্প, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, আশ্বিন ১৩৫৬, পৃ. ৭৫
৩. দাশ, জীবনানন্দ, ১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা-৭৩, চতুর্দশ মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৪২১, পৃ. ১১২
৪. রায়, অন্নদাশঙ্কর, খুকু ও খোকা, রাঙাধানের খই, ছড়া-সমগ্র, বানী শিল্প, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ৩৬
৫. কুণ্ডু, চন্দনকুমার, নিবেদন অংশ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পণে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, বড়দিন, ২০১২, পৃ. ৯
৬. ‘ফ্ল্যাশ ব্যাক’, স্মৃতিচারণ, অনুলিখন রিন্টু চট্টোপাধ্যায়, ‘সাপ্তাহিক বর্তমান,’ ২০, ২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৬, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা অংশ, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সলিল সেন, নতুন ইহুদী, দে’জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় দে’জ সংস্করণ: এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৯-১০
৭. সেন, সলিল, নতুন ইহুদী, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় দে’জ সংস্করণ: এপ্রিল ২০১১, পৃ. ২১
৮. তদেব, পৃ. ৬৪
৯. তদেব, পৃ. ৭৮
১০. তদেব, পৃ. ৭২
১১. তদেব, পৃ. ৬৪-৬৫
১২. তদেব, পৃ. ৫০-৫১
১৩. ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দশম সংস্করণ: জুলাই ২০১৮, পৃ. ৭৬
১৪. সেন, সলিল, নতুন ইহুদী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬১
১৫. তদেব, পৃ. ৮৯
১৬. তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা, ভূমিকা অংশ, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সলিল সেন, নতুন ইহুদী, দে’জ পাবলিশিং, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩